তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবন

সমাজ পরিচালনার প্রয়োজনেই গড়ে উঠে মানুষের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রতিটি সংস্কৃতিতেই সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি ও রীতি-নীতি। ক্ষমতা ও নেতৃত্বের বণ্টনের মধ্য দিয়েই মানব সমাজে রাজনৈতিক-ব্যবস্থা বা রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচনা হয়। সভ্যতা যত এগিয়েছে তাদের রাজনৈতিক জীবনও ততই বিকশিত হয়েছে। এর চূড়ান্ত রূপ হলো আধুনিক কালের গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও এর পাশাপাশি তাদের রয়েছে নিজস্ব রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- বিভিন্ন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত আইন বর্ণনা করতে সক্ষম হব ;
- সামাজিক বিচারকার্যের ধরন ও পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারায় প্রথাগত শাসনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব ;
- ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর রাজনৈতিক জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভে আগ্রহী হব ;

পাঠ- ০১ এবং ০২: প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহেরও রয়েছে নিজস্ব প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা। সমাজের যিনি প্রধান বা সমাজপতি তিনিই এই প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষ প্রতিষ্ঠান এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক।

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, খিয়াংসহ বিভিন্ন জাতিসত্তার জীবনধারা এখনও তাদের প্রথাগত আইন ও শাসন-ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়, যা রাষ্ট্রের আইন দ্বারাও স্বীকৃত। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা যেমন - রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের জন্য রয়েছে তিনটি সার্কেল বা প্রথাগত প্রশাসনিক এলাকা। সেগুলো হলো- চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল এবং মং সার্কেল। চাকমা সার্কেলটি রাঙামাটি জেলায়, বোমাং সার্কেল বান্দরবান জেলায় এবং মং সার্কেলটি খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত। প্রতিটি সার্কেলে আছেন একজন সার্কেল প্রধান, যিনি রাজা নামে বেশি পরিচিত। প্রত্যেকটি সার্কেল আবার কয়েকটি মৌজায় এবং প্রতিটি মৌজা কয়েকটি আদাম বা পাড়ায় (বাংলায় গ্রাম) বিভক্ত। প্রত্যেকটি মৌজায় আছেন একজন হেডম্যান, যিনি রাজার সুপারিশ অনুসারে জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত হন। হেডম্যান মৌজার প্রজাদের কাছ থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জুম বা ভূমি কর আদায় এবং সামাজিক বিচার আচার সম্পাদনসহ সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অনুরূপভাবে একটি পাড়ার প্রধান হলেন কারবারী। তিনিও তার আদাম বা পাড়ায় সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকেন এবং সমাজের সদস্যদের যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত প্রথাগত আইন অনুসারেই এসব বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। কারবারীর প্রথাগত আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পারলে ঐ ব্যক্তি হেডম্যানের আদালতে এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হলে রাজার কোর্টে আপীল করতে পারেন। অনুরূপভাবে, দেশের সমতল অঞ্চলের মান্দি, খাসি, মণিপুরী, সাঁওতাল, হাজং প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর সমাজেও নিজ নিজ প্রথাগত আইন চালু আছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে মান্দি এবং খাসিদের সমাজ হলো মাতৃসূত্রীয় (Matrilineal)। মান্দি সমাজের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সামাজিক-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আখিং নকমা (নকমা মানে প্রধান), সংনি নকমা (গ্রাম প্রধান), ত্রা পাছে (মেয়ে পক্ষের পুরুষ আত্মীয়) প্রভৃতি ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দেশের সাধারণ প্রশাসনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কারণে ধীরে ধীরে মান্দিদের এসব প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব কমে এলেও তাদের প্রথাগত নৈতিক আইন এবং অনুশাসন এখনও যথাসম্ভব মেনে চলা হয়। অনুরূপভাবে খাসি জনগোষ্ঠীর সমাজে রয়েছে পুঞ্জীভিত্তিক মন্ত্রী বা হেডম্যান প্রথা, বংশভিত্তিক পরিষদ "সেংকুর", "খাদ্দুহ্" প্রভৃতি ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান। হাজংদের কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি পাড়া এবং কয়েকটি পাড়া নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হয়। পাড়া প্রধানের উপাধি হলো "গাঁও বুড়া" এবং গ্রাম প্রধানকে বলা হয় 'মোড়ল'। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় একটি চাকলা বা জোয়ার এবং কয়েকটি চাকলার সমন্বয়ে গঠিত হয় এক একটি পরগনা। চাকলার প্রধান হলেন 'সড়ে মোড়ল' আর পরগনা প্রধানের উপাধি হলো রাজা। রাজা হলেন হাজংদের সর্বোচ্চ শাসক, রক্ষক ও প্রতিপালক। তবে বাংলাদেশের হাজং সমাজে রাজা প্রথাটি এখন আর প্রচলিত নেই। অন্যদিকে সাঁওতাল সমাজের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থা এখনও বহাল আছে। গ্রামের প্রধানকে বলা হয় মাজহী। যিনি নৈতিকভাবে যাবতীয় বিষয়ের অভিভাবক তার নাম জগমাজহী। এছাড়া আছেন পারানিক (মাজহী সহকারী), নায়কে (পুরোহিত), কুড়ম নায়কে (সহকারী পুরোহিত)

এবং গোডেথ (বার্তাবাহক)। সমাজের যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তাদের আছে চার স্তর বিশিষ্ট আদালতের প্রথাগত বিচার-পদ্ধতি। সেগুলো হলো মাজহী, দেশ মাজহী পরগনা এবং ল-বির বা জঙ্গল মহাসভা। বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট এলাকাকে সাঁওতালরা দিশাম বলে অভিহিত করে থাকেন। আর ল-বির হলো তাদের সর্বোচ্চ আদালত, যা বছরে একবার বসে। এই আদালতে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে সমাজের জটিল সব সমস্যার সমাধান করেন। ল-বির প্রধানকে বলা হয় দিহরি। এভাবে বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা তাদের প্রথাগত আইন, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি এবং অনুশাসন যুগ যুগ ধরে এবং বংশ পরম্পরায় পালন করে আসছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত শাসন কাঠামোর বিবরণ দাও।
কাজ- ২:	বাংলাদেশের হাজং এবং সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত শাসন কাঠামো সম্পর্কে যা জানো লেখ।

পাঠ- ০৩ : প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থাটি আসলে কী এবং কেন প্রয়োজন, সেটি ভালোভাবে জানার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদের বেশ আগ্রহ আছে। প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য দেশের সাধারণ শাসন ব্যবস্থার সাথে এর পার্থক্যকে আমাদের বুঝতে হবে। আমরা জানি যে, আমাদের দেশে একটি সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এ শাসন ব্যবস্থায় রয়েছে একটি সংবিধান, সরকার। এ সরকার পরিচালনার জন্য রয়েছে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এভাবে একটি রাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন ইউনিটের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের কল্যাণের জন্য পরিচালিত যাবতীয় কার্যক্রমই হচ্ছে দেশের সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা।

অন্যদিকে, প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা হলো একটি সীমিত আকারের শাসন-ব্যবস্থা। কারণ, এই ব্যবস্থাটি বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীকে ঘিরে পরিচালিত হয়, যা দেশের সাধারণ জনগণের জন্য প্রযোজ্য নয়। সাধারণত পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে এসব প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা চালু আছে। ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো ঐতিহাসিকভাবে বরাবরই রাষ্ট্রের সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার বাইরে ছিল। তাদের বসতি অঞ্চলগুলো প্রধানত দুর্গম এবং পাহাড়-পর্বত ও বনাঞ্চলের মাঝে অবস্থিত হওয়ায় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসন বা নজরদারির বাইরে থেকে গিয়েছিল। এভাবে স্মরণাতীত কাল থেকে তারা নিজেদের রাজা বা গোষ্ঠী প্রধানের নেতৃত্ব মেনে আলাদা কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং স্বতন্ত্র জীবনধারা নিয়ে প্রকৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। দেশের সাধারণ প্রশাসন বা শাসন-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে বংশ পরম্পরায় তাদের সমাজে গড়ে উঠেছিল বিশেষ কিছু প্রথা, রীতি নীতি, অনুশাসন এবং মূল্যবোধ যেগুলো নিজ সম্প্রদায়ের সকল সদস্যের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক ছিল। নিজেদের মধ্যে যে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য তারা গ্রাম, মৌজা, গোষ্ঠী প্রধান বা রাজার দেওয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিত। এভাবে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক, গোত্রগত শৃঙ্খলা এবং শাসন সুসংহত রাখতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে সর্বজনগ্রাহ্য বিশেষ কিছু নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি ও প্রথা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এসব রীতি-নীতি এবং নিয়ম কানুনই প্রথাগত আইন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ

করে। আর প্রথাগত এসব আইন কানুনের দ্বারা যখন সমাজ শাসিত হয় তখন তাকে প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা বলা হয়। এসব প্রথাগত আইনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত শাসন-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের সাধারণ শাসন-ব্যবস্থায় এবং সংবিধানে এসব প্রথাগত আইন ও রীতি নীতির প্রয়োগ বা স্বীকৃতি না থাকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত শাসনের গুরুত্বও ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতা বজায় রাখার স্বার্থে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও প্রথাগত শাসন পদ্ধতিগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি।

পাঠ- ০৪: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামো

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোতে অঞ্চল ও নৃগোষ্ঠীভেদে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন - দেশের প্রায় ৪৫ টি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে মান্দি এবং খাসি জনগোষ্ঠী হলো মাতৃসূত্রীয় এবং বাকি সবাই পিতৃসূত্রীয়। স্বভাবতই মাতৃসূত্রীয় সমাজ কাঠামোর সাথে পিতৃসূত্রীয় সমাজ কাঠামোর বেশ পার্থক্য রয়ে গেছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং দেশের সমতল অঞ্চলের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যেও রয়েছে বেশ কিছু পার্থক্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজ পিতৃসূত্রীয়। তারা সবাই চাকমা, বোমাং এবং মং এই তিনটি সার্কেলের মধ্যে কোনো না কোনো একটির বাসিন্দা। সার্কেল প্রধান হলেন রাজা এবং রাজার আদালতই প্রথাগত আইন ও শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ আদালত। রাজা তার সার্কেলের আওতাভুক্ত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার কার্য ও বিরোধ নিজ নিজ নৃগোষ্ঠীতে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী সমাধা করে থাকেন। এর পরের স্তরে আছেন হেডম্যান বা মৌজা প্রধান। তিনি তার মৌজার বাসিন্দাদের সামাজিক বিরোধ ও বিচার কাজ নিষ্পত্তি এবং সরকার নির্ধারিত হারে ভূমি ও জুমের খাজনা আদায় করেন। হেডম্যানের বিচার কাজে সন্তুষ্ট না হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রাজার আদালতে আপিল করতে পারেন। এর পরে রয়েছেন গ্রাম প্রধান বা কারবারী। তিনিও একইভাবে তার গ্রামের বাসিন্দাদের সামাজিক বিরোধ নিস্পত্তি করেন এবং গ্রামের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। কয়েকটি পরিবার নিয়ে গঠিত হয় এক একটি গ্রাম (চাকমা ভাষায় যার নাম আদাম বা পাড়া)। পিতা হলেন পরিবারের কর্তা। পরিবারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিতার ভূমিকাই মুখ্য। অন্যদিকে মান্দি ও খাসি সমাজ মাতৃসূত্রীয় হওয়ায় পরিবারে মাতা এবং মামার ভূমিকাই প্রধান, যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে।

বর্তমানে সমাজপতি হিসাবে রাজার অস্তিত্ব না থাকলেও প্রাচীনকালে মান্দি সমাজে রাজপ্রথা বা রাজার শাসন চালু ছিল। সময়ের পরিক্রমার সাথে মান্দিদের প্রথাগত নেতৃত্বে ও ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন এসেছে। এক সময় আখিং নকমা (আখিং প্রধান), সংনি নকমা (গ্রাম প্রধান), ট্রা পাছে (মেয়ের পক্ষের পুরুষ আত্মীয়বর্গ) প্রভৃতি প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের বেশ গুরুত্ব ছিল। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আগে সমাজের যাবতীয় বিরোধ এবং অপরাধের বিচার নিস্পত্তি হতো। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলে সমাজের সদস্যরা এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং দেশের সাধারণ প্রশাসন ও আইন আদালতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন।

অন্যদিকে মণিপুরী সমাজে ঐতিহ্যবাহী প্রথাগত প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও টিকে আছে। পাড়া বা গ্রাম হচ্ছে মণিপুরী সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট। প্রত্যেক গ্রামে রয়েছে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত। গ্রামের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিযুক্ত হন। সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন বিরোধ এবং অপরাধের বিচার গ্রাম পঞ্চায়েত নিষ্পত্তি করে থাকে। মণিপুরীদের সব গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে উঠে পরগনা পঞ্চায়েত। জনপ্রতিনিধিসহ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এই পরগনা পঞ্চায়েতের সদস্য পদ লাভ করেন। গ্রাম পঞ্চায়েতে যেসব বিরোধ বা সমস্যার নিষ্পত্তি হয় না সেসব জটিল এবং অমীমাংসিত সমস্যাগুলো পরগনা পঞ্চায়েতে নিষ্পত্তি করা হয়। সিংলুপ নামে মণিপুরীদের আরেকটি প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় বিষয়াদি নিয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই সিংলুপের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই সিংলুপের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে তাদের নিজস্ব প্রথাগত নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা কাঠামো রয়েছে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাদে অন্য প্রায় সকল নৃগোষ্ঠীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের প্রথাগত নেতৃত্ব মূলত গ্রামকেন্দ্রিক। গ্রাম সমাজকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে তাদের বিভিন্ন প্রথাগত প্রতিষ্ঠান, নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামো। এর পাশাপাশি বর্তমানে দেশে প্রচলিত সাধারণ প্রশাসনের গুরুত্বও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ সমাজের অগ্রসর এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই এখন দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে জনপ্রতিনিধি কিংবা সামরিক বেসামরিক আমলা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রথাগত নেতৃত্ব এবং দেশের সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাও কোথাও কোথাও লক্ষ করা যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত নেতৃত্ব এবং সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামোর সহাবস্থান এখানে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হতে পারে। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত নেতৃত্ব এবং ক্ষমতা কাঠামোর (রাজা-হেডম্যান-কারবারী) পাশাপাশি রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং দেশের সাধারণ জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। এই পরিষদের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন মূলত পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে আসা রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং অন্যান্য স্থানীয় পরিষদসমূহের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম এবং অন্যান্য বিষয়, তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলার তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন; ভারী শিল্পের লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্বসহ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত রীতিনীতি, সামাজিক বিচার-আচার, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, এনজিও কার্যক্রম, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকাণ্ড- প্রভৃতির তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন করা পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অনেক নেতা কর্মী জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের জাতীয় রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাদের কেউ কেউ সংসদ সদস্য, জেলা পরিষদ কিংবা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে

থাকেন। প্রথাগত নেতৃত্ব ও শাসন কাঠামোর বাইরে জাতীয় রাজনীতিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অংশগ্রহণ কিংবা ভূমিকাও দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের প্রেক্ষাপট এবং এর কার্যবলি সম্পর্কে আলোচনা করো।
কাজ- ২:	একজন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যের পদবি কি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা কাঠামোর অংশ?

পাঠ- ০৫: প্রথাগত আইন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নিজস্ব প্রথাগত আইন রয়েছে। নৃগোষ্ঠী ভেদে প্রথাগত আইনগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও দেখা যায়। যেমন, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইন প্রায় ক্ষেত্রে অভিন্ন হলেও সমতল অঞ্চলের নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইনের সাথে সেগুলোর যথেষ্ট ভিন্নতা রয়েছে। এখানে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সমতল অঞ্চলের কিছু কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত আইন সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথাগত আইন : প্রথাগত আইন হলো জনগণের জীবনধারা এবং জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনীয়তা থেকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে উঠা চিরকালীন রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। এসব চিরকালীন রীতি-নীতি বা নিয়মের মূলে আছে জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সমষ্টিগত জ্ঞান এবং কোন সমস্যায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে স্মরণাতীত কাল থেকে সমাজে চালু থাকা দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ। সাধারণত জনগোষ্ঠীর প্রধানগণ, তাদের পারিষদবর্গ, তাদের সন্তান এবং এই সন্তানদেরও পরবর্তী সন্তানেরা এসব দৃষ্টান্ত ও নিয়মকানুন বংশ পরম্পরায় নিজেদের স্মৃতিতে লালন করে চলেন। যুগের পর যুগ ধরে বয়ে নিয়ে আসার ফলে এসব দৃষ্টান্ত বা রীতি-নীতির কিছু কিছু হয়তো তাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। আর অবশিষ্ট যা থাকে সেগুলো চিরকালের নিয়ম বা বিধানে পরিণত হয়। এভাবে জনগোষ্ঠীর মাঝে সুপ্রতিষ্ঠিত চিরকালীন নিয়ম বা বিধানই হলো প্রথাগত আইন।

তবে প্রথাগত আইন হতে হলে তাকে অনেক প্রাচীন আমলের হতে হবে কিংবা গোষ্ঠী প্রধানকে সেগুলো পরিচালিত করতে হবে এমন কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। একটি প্রথাগত আইন সমসাময়িক কালেরও হতে পারে এবং জনগোষ্ঠীর সাধারণ সদস্যরাও এই আইন বাস্তবায়ন করতে পারে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রথাগত আইন বলতে কী বোঝায়?
কাজ- ২:	তোমার সমাজে কী ধরনের প্রথাগত আইন রয়েছে? খুঁজে বের করো।

পাঠ- ০৬ : প্রথাগত আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য

আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, প্রথাগত আইন হচ্ছে যুগ যুগ ধরে কোনো জনগোষ্ঠীতে বংশ পরম্পরায় অনুসৃত হয়ে আসা চিরকালীন রীতি-নীতি এবং নিয়ম-কানুন বা সেসব রীতি-নীতি ও নিয়ম-কানুনের সমষ্টি। প্রথাগত আইন শুধু সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বেলায় প্রযোজ্য। যারা ঐ জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সদস্য নন তাদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত প্রথাগত আইন প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে সাধারণ আইন হলো সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত আইন, যা সারা দেশে এবং সব নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতি বজায় রাখার জন্য এবং নাগরিকদের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সরকারের মাধ্যমে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। এসব নীতিমালার ভিত্তিতে, যে বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য, সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন তৈরি করা হয়। সরকারের মন্ত্রিসভা এবং জাতীয় সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পর মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি ও স্বাক্ষর নিশ্চিত হলে তবে ঐসব বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন রাষ্ট্রীয় আইনে পরিণত হয়। আইনে পরিণত হওয়ার পর সেসব বিধি-বিধান দেশের আদালত বা বিচার-ব্যবস্থা এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ প্রশাসনের মাধ্যমে সারা দেশে সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে উঠে। এদিক থেকে রাষ্ট্রীয় আইন হলো একটি ব্যাপকতর ও সর্বজনীন আইন। এর পরিধি ব্যাপক এবং সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

প্রথাগত আইন হলো শুধু বিশেষ কোনো জনগোষ্ঠীর দ্বারা উদ্ভাবিত এবং ঐ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রযোজ্য আইন। এসব প্রথাগত আইন হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য প্রায় অলংঘনীয়, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিসরে অবশ্য পালনীয় নয়। প্রথা ভাঙলে রাষ্ট্র শাস্তির বিধান করে না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী শাস্তির বিধান করে থাকে। বংশ পরম্পরায় যুগের পর যুগ ধরে পালন করতে করতে কোনো নিয়ম বা লোকাচার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে এতটাই অলঙ্ঘনীয় হয়ে পড়ে যে, তার ব্যতিক্রম ঘটানো বা প্রচলিত ঐ নিয়মকে অমান্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। এধরনের নিয়ম বা লোকাচার চিরকালের প্রথা বা বিধি-বিধানে পরিণত হয়। আর এসব প্রথার প্রতি সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর থাকে অগাধ বিশ্বাস, আস্থা এবং দুর্বলতা। এই নির্ভরতার সাথে জড়িত থাকে ঐ মানবগোষ্ঠীর লৌকিক-অলৌকিক বিশ্বাস, আদি জ্ঞান, হাজার বছরের অভিজ্ঞতা এবং চিরাচরিত কিছু অভ্যাস ও অনুশীলন।

বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলে না হলেও 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি- ১৯০০' অনুসারে পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইন ও জীবনধারা রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। কারণ দেশের সাধারণ আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পাশাপাশি কয়েক দফা সংশোধনীর পর 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি- ১৯০০' এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ আছে। এই শাসনবিধিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইন ও জীবনধারাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদে কী কী বিষয় আইন হিসেবে গণ্য হবে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, "আইন" অর্থ কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো প্রথা বা রীতি। এদিক থেকে দেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীসমূহের মাঝে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত প্রথা বা রীতি-নীতির জন্য এক ধরনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আছে বলা যায়।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	প্রথাগত আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কী কী পার্থক্য রয়েছে তা বুঝিয়ে লেখ।
কাজ- ২:	'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০' ব্যাখ্যা করো।

পাঠ- ০৭: প্রথাগত আইনে অপরাধের বিচার

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় প্রথাগত আইনের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে। গুরুতর কোনো অপরাধ বা বিরোধের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলো দেশের সাধারণ আইন বা প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও সচরাচর প্রথাগত আইনের সাহায্যেই এখনও নিজেদের সব বিরোধ বা সমস্যা নিষ্পত্তি করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ জেলা প্রশাসন এবং আইন-আদালত বহাল থাকলেও ফৌজদারি কিংবা ভূমি সংক্রান্ত গুরুতর অপরাধ ছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের অন্যান্য সামাজিক বিরোধ বা সমস্যা প্রথাগত আইনের মাধ্যমে কারবারি, হেডম্যান বা রাজার আদালতে মীমাংসা করা হয়। এখানে প্রথাগত আইন দ্বারা সাধারণত যেসব বিষয়ে সমস্যার নিষ্পত্তি করা হয় সেগুলো হলো - বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সন্তান দত্তক গ্রহণ, স্ত্রীর মর্যাদা ও ভরণপোষণ, পিতৃত্ব এবং পিতার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, নাবালকের অভিভাবকত্ব, দান গ্রহণ ও হস্তান্তর, পরিবারের ভরণপোষণ, উইল সম্পাদন এবং অন্যের সম্পদের ক্ষতিসাধন, সম্মানহানি, অসামাজিক কার্যকলাপ প্রভৃতিসহ নানা সামাজিক বিরোধ ও অপরাধের বিচার। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের এসব প্রথাগত আইনের উৎস হলো সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, প্রাচীনকাল থেকে লালন করে আসা মূল্যবোধ ও বিশ্বাস; ধর্মীয় আনুগত্য ও অনুশাসন; প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য এবং নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো প্রথাগত আইনের মাধ্যমে সাধারণত যেসব অপরাধের বিচার কিংবা বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

অপরাধের ধরন -

১) জুমচাষের ভূমি বা অন্যান্য সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ;

২) ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি চুরি বা বেদখল করা;

৩) জনগোষ্ঠীর সামাজিক মালিকানার সম্পত্তি বা সেবা, যেমন– জনসাধারণের পানির উৎস, সামাজিক বন, রাস্তাঘাট, ধর্মীয় স্থান, শ্মশান প্রভৃতির ক্ষতি সাধন বা পবিত্রতা নষ্ট করা;

৪) অন্যের জমির ফসল বা বাগানের ক্ষতি সাধন করা;

৫) অন্যের সম্মানহানি এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা;

৬) পরিবার ও সমাজে কলহ সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট করা;

৭) মিথ্যা বলা, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতিসহ নানা অসামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের সম্মান নষ্ট করা;

৮) পরিবারের সদস্যদের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা;

৯) সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করা;

১০) ভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা;

১১) ঋণ বা দেনা পরিশোধ না করা;

১২) সামাজিক প্রথা বা রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অন্য কারও ধর্মীয় ও সামাজিক বিশ্বাস বা অনুভূতিতে আঘাত করা;

১৩) বেপরোয়াভাবে ও নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস এবং বনের পশু-পাখি হত্যা করা;

১৪) শিক্ষা, সংস্কৃতিচর্চা এবং ধর্ম পালনে বাধাদান প্রভৃতি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো দেশের সমতল অঞ্চলের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলোও নিজেদের সমাজের নানা সমস্যা ও বিরোধ প্রথাগত আইনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করে থাকে। তবে তাদের সমাজে দেশের সাধারণ প্রশাসন এবং বিচার-ব্যবস্থার প্রভাব ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সামাজিক সমস্যা ও বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দেশের ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীগুলো প্রধানত তাদের প্রথাগত আইনই মেনে চলে। এখানে বৃহত্তর ময়মনসিংহসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী মান্দিদের সমাজ-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যুগ যুগ ধরে মান্দি জনগোষ্ঠী তাদের কিছু প্রথাগত নৈতিক আইন ও রীতি নীতি মেনে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখছে। তাদের বিশ্বাস হলো, সমাজে কেউ যদি দুর্নীতি, নিয়মভঙ্গ বা অন্যায় কাজ করে থাকে তাহলে সূর্য ও চন্দ্রের দেবতা সালজং এবং সুসিমে তাকে শাস্তি দেন। এছাড়া তাদের সমাজের প্রথাগত গ্রাম আদালত বা ত্রা-ও শাস্তির বিধান করে থাকে। ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি বা বিধি-নিষেধ মেনে না চলা, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য না করা, সংরক্ষিত পবিত্র বন থেকে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি সংগ্রহ, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা, একই গোত্রের মধ্যে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ না করা; চুরি, মিথ্যাচার ও হুমকি প্রদান; দেনা পরিশোধ না করা, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের ক্ষতি করা প্রভৃতি কাজ মান্দি সমাজে গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচিত। এসব অপরাধের জন্য দেবতা কর্তৃক শাস্তি ছাড়াও সমাজে নানা শাস্তির বিধান রয়েছে। কিছু কিছু ব্যতিক্রম বাদে অনুরূপ প্রথাগত আইন সাঁওতাল, মণিপুরী, হাজং, কোচ, ডালু, বর্মন, খাসি, ওরাঁও, মুন্ডাসহ বাংলাদেশের সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে কমবেশি প্রচলিত রয়েছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইনে সাধারণত কী কী অপরাধের বিচার করা হয়?
কাজ- ২:	মান্দি সমাজে কী ধরনের প্রথাগত আইন চালু আছে? সাধারণত কোন কোন ক্ষেত্রে সেসব আইন প্রয়োগ করা হয়?

পাঠ- ০৮: সামাজিক বিচার ব্যবস্থা

ন্যায়বিচার ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দেশের সাধারণ বিচার-ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত সামাজিক বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য হয়তো নেই। তবে বিচার প্রক্রিয়া এবং বিচারের বিষয় ও পরিধির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য রয়ে গেছে। দেশের সাধারণ দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাধ্যমে অনুমোদিত ও প্রবর্তিত আইনের দ্বারা সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের সমাজে প্রচলিত সামাজিক বিচার-আচার সম্পন্ন হয় যুগ যুগ ধরে চলে আসা এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত রীতি-নীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং অবশ্য পালনীয় নিয়ম-কানুন ও বিধি-বিধানের ভিত্তিতে। সাধারণ বিচার-ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য রয়েছে দেশের আইন-আদালত, প্রশাসন বা সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। আর প্রথাগত আইনে সামাজিক বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সমাজের বিভিন্ন স্তরে নির্ধারিত নৈতিক ও সামাজিক কর্তৃপক্ষ। যাদের দায়িত্ব হলো সমাজের প্রচলিত বিধান অনুযায়ী বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। এই পর্বে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কিছু কিছু ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা-সম্পর্কে আলোচনা করবো।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের নিজ নিজ প্রথাগত আইন থাকলেও সেসব আইনে কীভাবে সামাজিক বিচার-ব্যবস্থা পরিচালিত হবে তা পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (শাসনবিধি) ১৯০০ দ্বারা নির্ধারিত আছে। এই শাসনবিধির আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেল প্রধান বা রাজা এবং তাঁদের নিচের স্তরে হেডম্যান ও কারবারিরা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর নিজ নিজ প্রথাগত আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়-বিচার ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করে থাকেন। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচার-ব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত। যেমন - কারবারির আদালত, হেডম্যানের আদালত এবং সার্কেল প্রধান বা রাজার আদালত। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত প্রথাগত শাসন-কাঠামো দেখানো হলো:

পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন কাঠামো

পদবি	প্রশাসনিক এলাকা
রাজা বা রানি	চাকমা, বোমাং এবং মং সার্কেলের তিনজন সার্কেল প্রধান।
হেডম্যান	মৌজা প্রধান। বর্তমানে মোট ৩৯০ টি মৌজা রয়েছে।
কারবারি	পাড়া বা গ্রামের প্রধান।

চিত্র ৩.১ : পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত শাসন কাঠামো

সামাজিক বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরটি হলো কারবারির আদালত। কারবারি পাড়া বা গ্রামের প্রধান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি গোষ্ঠীপতিও। সমাজের সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সামাজিক সমস্যা ও

অপরাধ প্রথাগত আইন অনুসারে তিনি নিষ্পত্তি করে থাকেন। তাঁর রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পারলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ হেডম্যানের আদালতে আপিল করতে পারে। হেডম্যান হলেন মৌজার প্রধান। কয়েকটি পাড়া বা গ্রাম নিয়ে এক একটি মৌজা গঠিত হয়। হেডম্যান তার মৌজার অধিবাসীদের দ্বারা উপস্থাপিত বিরোধের সকল বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। তাঁর রায়ে অসন্তুষ্ট পক্ষ ন্যায়বিচার প্রাপ্তির জন্য রাজার আদালতে আপীল করতে পারে।

হেডম্যান এবং রাজা দোষী ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড কিংবা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারেন। তাঁরা অন্যায়ভাবে সংগৃহীত মালামাল বা সম্পদ ফেরত প্রদানে দোষী ব্যক্তিকে বাধ্য করতে পারেন।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	দেশের সাধারণ বিচার-ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত সামাজিক বিচার-ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো।
কাজ- ২:	পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ অনুযায়ী হেডম্যান এবং কারবারীর কী কী দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে?

পাঠ - ০৯ এবং ১০: কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার ব্যবস্থার উদাহরণ

চাকমা সমাজে নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ: রক্ত সম্পর্কিত নিকটাত্মীয় এবং ভিন্ন ধর্ম ও জাতির পাত্রের সাথে বিবাহ চাকমা সমাজে নিষিদ্ধ। এ ধরনের কোনো বিবাহকে নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ বলে গণ্য করা হয়। নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ দম্পতিকে সামাজিক আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করার বিধান রয়েছে। সমাজে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী শপথনামা পাঠ কিংবা অন্যান্য প্রথাগত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করলেও এ ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ বা অননুমোদিত বিবাহ বলে গণ্য হবে। এ ধরনের অননুমোদিত বিবাহ বা নিষিদ্ধ সম্পর্কের শাস্তি স্বরূপ চাকমা সমাজের প্রথা অনুযায়ী জরিমানা হিসাবে শূকর ও অর্থদণ্ড দিতে হয়।

সম্পত্তিতে চাকমা নারীর উত্তরাধিকার: চাকমা সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিলে প্রথাগত আইন অনুযায়ী তার প্রতিকারের বিধান রয়েছে। সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে, চাকমা সমাজে নারীরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় না। এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য নয়। কোনো পিতা ইচ্ছা করলে তার সম্পত্তি পুত্র কন্যা নির্বিশেষে সবার মাঝে সমান ভাবে বণ্টন করে দিতে পারেন। এ ছাড়া কোনো পিতা মাতা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে কন্যারা তাদের সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। সন্তান বা অন্য কোনো উত্তরাধিকারী ছাড়া ভাই মারা গেলে বোনেরাই তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এছাড়া বিধবা স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। বর্তমানে চাকমা সমাজের নারীরা যাতে পুরুষ উত্তরাধিকারীদের মতো সম্পত্তির সমান অংশ পায় তার জন্যে চাকমা সমাজের প্রথাগত আইনের সংশোধন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা অব্যাহত আছে।

লুসাই জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার ব্যবস্থা: পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে লুসাইরা জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। লুসাই সমাজপতি বা সর্দারকে 'লাল' নামে অভিহিত করা হয়। ব্রিটিশ শাসনামলের পুর্বে 'লাল'-এর কর্তৃত্বাধীনে লুসাই সমাজের বিচার ও শাসন কার্য পরিচালিত হতো। সমাজপতি বা সর্দারকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপা (কাউন্সিলর), পুইথিয়াম (পুরোহিত), জালেন (নিরপেক্ষ), রামহুয়ালতু (ভূমি বিশেষজ্ঞ), টুলাংআউ (ঘোষক) এবং থিরদেং (কামার) এসব পদবিধারীরা নিয়োজিত ছিল। পরে ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি প্রবর্তিত হওয়ায় এর অধীনে কারবারী, হেডম্যান এবং সার্কেল চিফ- এই তিন স্তরের প্রথাগত আদালতের মাধ্যমে তাদের যাবতীয় সামাজিক বিরোধ নিষ্পন্ন হয়ে আসছে। লুসাই সমাজের প্রথাগত আইন অনুসারে মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রী আইনগত উত্তরাধিকারী নন। মৃতের পুত্র সন্তানরাই পিতার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। আর পুত্র সন্তান যদি না থাকে তাহলে মৃত ব্যক্তির ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র বা গোত্রের রক্ত সম্পর্কিত পুরুষ আত্মীয়রাই মৃতের সম্পত্তি পেয়ে থাকে। কণিষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পত্তির বড় অংশ পেয়ে থাকে। কারণ লুসাই সমাজের রীতি অনুসারে তাকে পিতা মাতার ভরণপোষণ করতে হয়। তবে মৃতের বিধবা স্ত্রী সন্তানদের সাথে বসবাস করলে পরিবারে তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়। আর বিধবা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করলে তাকে আগের স্বামীর পরিবার থেকে আমৃত্যু ভরণপোষণ লাভের অধিকার হারাতে হয়।

কন্যা সন্তানেরা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হলেও বিয়ের আগ পর্যন্ত পরিবার থেকে যাবতীয় ভরণপোষণ পেয়ে থাকে। তবে পিতা মাতা বা অন্য কেউ যদি কোনো সম্পত্তি দান বা উইল করে দেন তাহলে কন্যাদের সে সম্পত্তি পেতে কোনো বাধা নেই। বিবাহ বিচ্ছেদের কারণেও স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশ পেয়ে থাকে। বিবাহের আগে বা পরে নিজের উপার্জিত অর্থে বা স্বীকৃত অন্য কোনো উপায়ে সম্পত্তি অর্জন করলে তার উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা বা অধিকার লুসাই নারী ভোগ করতে পারেন। সমাজ স্বীকৃত সুনির্দিষ্ট কিছু কারণে স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই সমাজপতি বা সামাজিক আদালতের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। লুসাই ভাষায় বিবাহ বিচ্ছেদকে "ইনঠেন" বলা হয়।

বিধবা কিংবা স্বামী বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ লুসাই সমাজে স্বীকৃত। তবে স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণ না করে বা দাম্পত্য সম্পর্ককে নিরবচ্ছিন্ন না রাখে কিংবা যদি কন্যা সন্তান বা স্ত্রী নিজের বেলায় উপরে উল্লিখিত যাবতীয় অধিকার খর্ব হচ্ছে মনে করে, সেক্ষেত্রে সমাজপতি 'লাল' কিংবা সামাজিক ও দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করার মাধ্যমে তারা নিজেদের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

ওরাঁও জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিচার ব্যবস্থা: সমাজের যাবতীয় বিবাদ নিষ্পত্তি এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ওরাঁওদের গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম সংগঠন রয়েছে। এই সংগঠনকে তাদের ভাষায় পাঞ্চেস বলা হয়। গ্রামের বয়স্ক সাত আটজন ব্যক্তি নিয়ে সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য পাঞ্চেস গঠিত হয়। প্রতিটি গ্রামে একজন মহাতোষ এবং একজন পুরোহিত বা নাইগাস থাকেন। মূলত তাদের নেতৃত্বে পাঞ্চেস পরিচালিত হয়। পাঞ্চেস-এর কাছে বিচার প্রার্থীকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ফি পরিশোধ করতে হয়। সাধারণ বিবাদের জন্য এই ফি-এর পরিমাণ হয়ে থাকে ১.২৫ টাকা এবং জমি সংক্রান্ত বিবাদের জন্য ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত। পাঞ্চেস এর রায়ে সন্তুষ্ট হতে না পারলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ "পাঁড়হা-পাঞ্চেস"-এ আপীল করতে পারে। পাঁড়হা হলো সাধারণত সাত থেকে বারোটি গ্রাম নিয়ে গঠিত একটি কনফেডারেশন।

গ্রামের পাঞ্চেসের মধ্য থেকে একজনকে পাঁড়হা প্রধান বা রাজা নিযুক্ত করা হয়। ওরাঁও ভাষায় যার নাম "পাঁড়হা বেলাস"। তার নেতৃত্বে গঠিত হয় "পাঁড়হা পাঞ্চেস"। সমাজে বা গ্রামগুলোর মধ্যে কোনো বিবাদ সংগঠিত হলে "পাঁড়হা পাঞ্চেস" -এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক এসব বিচার ব্যবস্থা বা পাঞ্চেসের সদস্যগণ কোনো পারিশ্রমিক নেননা। তারা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। তবে সামাজিক বন্ধন শিথিল হওয়ার কারণে বর্তমানে ওরাঁও সমাজের অনেকেই প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার চেয়ে দেশের সাধারণ আইন আদালতের প্রতি বেশি আগ্রহী।

মান্দি জনগোষ্ঠীর সামাজিক-বিচার ব্যবস্থা: ওরাঁওদের মতো মান্দি জনগোষ্ঠীর সমাজে প্রচলিত কিছু সামাজিক বিচার প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। চুরি, অগ্নিসংযোগ, মিথ্যাচার, সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা, হুমকি প্রদান, শ্লীলতাহানির চেষ্টা ইত্যাদি অপরাধের জন্য মান্দি সমাজের গ্রাম প্রধান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মিলে শাস্তির বিধান করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো চোর ধরা পড়ে তাহলে তাকে চুরি যাওয়া যাবতীয় সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে বা টাকার অংকে সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। কারও ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই বাড়ি পুনঃনির্মাণ করে দেওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় এবং গ্রাম প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানাও আদায় করা হয়। ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহণকারীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে তা পরিশোধ করতে হয়। সমাজের কোনো সদস্য যদি কাউকে হুমকি দেয় তাহলে সেই অপরাধের জন্য তাকে কমপক্ষে এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়। তবে বাংলাদেশে নানা প্রতিকূল অবস্থার কারণে প্রথাগত সামাজিক আদালতের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় মান্দি সমাজের অনেকেই এখন দেশের সাধারণ প্রশাসন বা বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হন। বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে নিজস্ব প্রথাগত বিচার-ব্যবস্থা চালু থাকলেও সেগুলোর কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি এখনও নেই। তার উপর দেশের সাধারণ প্রশাসন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহের প্রথাগত আইন ও বিচার-ব্যবস্থার গুরুত্ব ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।

অনুশীলন	
কাজ- ১:	চাকমা সমাজে অননুমোদিত বিবাহ বলতে কী বোঝায়? সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে চাকমাদের প্রথাগত আইনের অবস্থান ব্যাখ্যা করো।
কাজ- ২:	লুসাই নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত নেতৃত্ব এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ব্যবস্থার বিবরণ দাও।
কাজ- ৩:	ওরাঁও নৃগোষ্ঠীর পাঞ্চেস প্রথা এবং সামাজিক বিচারে জরিমানার কিছু উদাহরণ তুলে ধরো।
কাজ- ৪:	মান্দি নৃগোষ্ঠীর সামাজিক বিচারে অভিযুক্তকে কী ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **মং সার্কেল কোন জেলায় অবস্থিত?**

ক. খাগড়াছড়ি খ. রাঙামাটি
গ. বান্দরবান ঘ. ময়মনসিংহ

২. **মানব সভ্যতার অগ্রগতির ফলে-**

i. নগরায়ণ ঘটে
ii. গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে ওঠে
iii. সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ঐশী কান্তির বাড়ি রাজশাহী জেলার কালীতারা গ্রামে। একটি পশু হত্যা নিয়ে তাদের সাথে পাশের গ্রামের বিবাদ দেখা দেয়। দুপক্ষই একটি আদালতে উপস্থিত হলে বছরের একটি নির্দিষ্ট দিনে শুনানি হয়। দুপক্ষ এ আদালত থেকে সুবিচার পায়।

৩. **কালীতারা গ্রামে কোন আদালতের কথা বলা হয়েছে?**

ক. ল'বীর খ. সেংকুর
গ. গ্রামপঞ্চায়েত ঘ. পরগনা পঞ্চায়েত

৪. **ঐশী কান্তির প্রাপ্ত বিচারে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর-**

i. সামাজিক সংহতি রক্ষিত হয়েছে
ii. সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে
iii. প্রথাগত অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১.

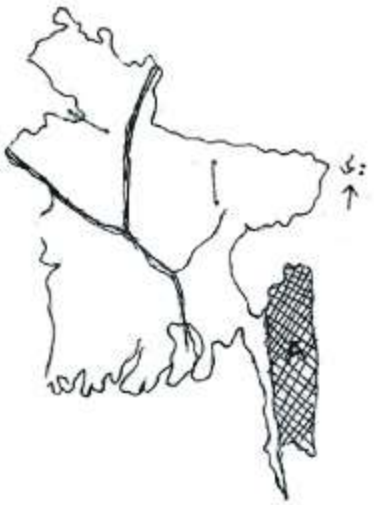

ক. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে সংহতির প্রতীক কে?

খ. প্রথাগত শাসন ব্যবস্থা বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে 'অ' চিহ্নিত অঞ্চলে যে শাসন বিধি কার্যকর তার ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. সমতল ভূমিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উপর উক্ত শাসন বিধি কতটুকু কার্যকর- বিশ্লেষণ করো।

২. অনুপম খিসা রাঙামাটি জেলার একটি গ্রামে বসবাস করেন। প্রতিবেশীর সাথে জমি নিয়ে একদিন তার বিবাদ হয়। তিনি পাড়ার প্রধানের নিকট বিচার চান। পাড়া প্রধানের বিচার তার মনঃপুত হলো না। তিনি পাড়া প্রধানের উপরের প্রধানের নিকট বিচার প্রার্থী হন। উক্ত প্রধান উভয় পক্ষের যুক্তি তর্ক শুনে সুন্দর সমাধান প্রদান করেন।

ক. ত্রা পাম্বে কী?

খ. হাজংদের চাকলা কীভাবে গঠিত হয়?

গ. অনুপম খিসা যে প্রধানের নিকট সুবিচার পেলেন তার কার্যবলি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সমাজের জটিল সমস্যা সমাধানে উক্ত প্রথাগত বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব মূল্যায়ন করো।